অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

আপন কথা

আপনার কথা

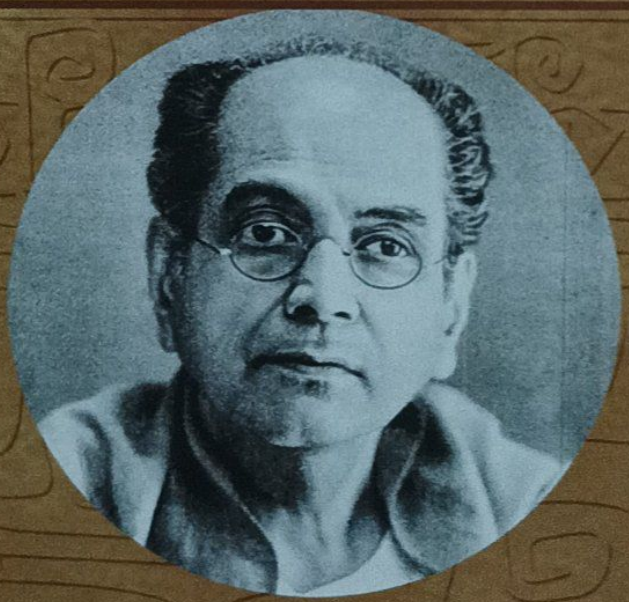

সম্পাদনা

ড. অনিমেষ গোলদার

দিয়া

Abanindranath Thakurer Apan Katha : Apanar Katha

Edited by : *Dr. Animesh Golder*

ISBN : 978-93-92110-49-8

Published by

DIYA PUBLICATION

44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
West Bengal ● India
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com
diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

প্রকাশনা সংক্রান্ত কথা
৭৪৩৯৮৭৭৪৫৬
বিপণন সংক্রান্ত কথা
৬২৯১৮১১৪১৫

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২৩

₹ ২৪০/-

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‘এ-বাড়ি ও-বাড়ি’ : ইতিহাস আর ঐতিহ্যের স্মৃতিকথা

প্রত্যুষ কুমার জানা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রশিল্পী—কী কথায়, কী রেখায়। সর্বত্র-ই তার সুষুমা হল অনুভূতি। স্মৃতিকথায়ও সেই অনুভূতিই প্রাধান্য। ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, ঠাকুর বাড়ির সমাজ, সেই সমাজের অতীত-বর্তমান, ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধান, কঠিন নিয়মের নিগড়ে বেড়ে ওঠা সেই সমাজের জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠতম সদস্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানা সম্পূর্ণ হতো না, যদি অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি-কথার চিত্র না আঁকতেন। আমাদের আলোচ্য অবনীন্দ্রনাথের ‘আপন কথা’র এ-বাড়ি ও-বাড়ি আত্মগত প্রবন্ধটি তারই অন্যতম দিক নির্দেশক। প্রবন্ধটি ‘বঙ্গাবাণী’ পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় এবং ‘চিত্রা’ পত্রিকায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ‘আপন কথা’ গ্রন্থটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের আষাঢ় মাসে, সিগনেট প্রেস থেকে। এই গ্রন্থটি অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া বা জোড়াসাঁকোর ধারে গ্রন্থের পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও এটি উল্লিখিত দুই গ্রন্থের অনেক আগের রচনা। অবনীন্দ্রনাথের এই আত্ম-নিষ্ঠ প্রবন্ধের, স্মৃতিকথার মর্মোদ্ধার করতে গেলে সম্পর্ক নামে উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় জানা জরুরি। দ্বিতীয়ত, ঠাকুর বাড়ির অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছাড়া পাঠকের গত্যন্তর নেই।

কর্তা, কর্তামহারাজ, কর্তাদাদা মশায় হলেন- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কর্তাদিদিমা হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সারদা দেবী। বাবা মশায় হলেন অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা হলেন অবনীন্দ্রনাথের মাতা সৌদামিনী দেবী। বড়োমা হলেন গণেন্দ্রনাথের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী। দুই পিসি হলেন গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগমায়া দেবীর দুই কন্যা কাদম্বিনী দেবী ও কুমুদিনীদেবী। পিসেমশায় হলেন—কুমুদিনী দেবীর স্বামী নীলকমল মুখোপাধ্যায়। অক্ষয় বাবু হলেন অক্ষয় মজুমদার।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বলতে বোঝাত নীলমণি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আদি ভদ্রাসন বাড়ি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বৈঠকখানা বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ও আদি ভদ্রাসন বাড়ি ছিল দোতলা। ক্রমবর্ধমান পরিবারের স্থান সংকুলানের জন্য প্রথমে ভদ্রাসন বাড়ি বা

ভিতর বাড়ি বা অন্তঃপুরকে পরে বৈঠকখানা বাড়িকে তিনতলায় পরিণত করা হয়। কোনোরকম পরিকল্পনা ছাড়াই আদি বাড়িতে নতুন নতুন অংশ সংযোজিত হয়েছে। রামলাল চাকর অবনীন্দ্রনাথের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ আদি ভদ্রাসন বাড়ির তেতলার উত্তরের ঘরেই কাটিয়েছেন—

> ওদিকটা ছিল সেকালের নিয়মে বারবাড়ির সামিল অন্দরে যারা থাকত তারা তেতলার টানা বারান্দার বন্ধ ঝিলমিল দিয়ে ওদিককার দেওয়া একটু আভাসমাত্র পেতে পারত। কি ছেলে, কি মেয়ে, কি দাসী, কি বউ কি গিন্নিবান্নি—সকলের পক্ষেই এই ছিল ব্যবস্থা। বেশি রাত না হলে দক্ষিণের ঝিলমিল দেওয়া জানলা ক'টা পুরোপুরি খোলা ছিল বেদস্তুর।[১]

'আপন কথা'র "বারবাড়ি"তে প্রবন্ধ থেকেও একথা স্পষ্ট হয়—"সেকালের নিয়ম অনুসারে একটা বয়েস পর্যন্ত ছেলেরা থাকতেম অন্দরে ধরা। তারপর একদিন চাকর এসে দাসীর হাত থেকে আমাদের চার্জ বুঝে নিত। কাপড় জুতো জামা বাসন-কোসনের মতো করে আমাদের তোষাখানায় নামিয়ে নিয়ে ধরত, সেখান থেকে ক্রমে দপ্তরখানা হয়ে হাতে-খড়ির দিনে ঠাকুর ঘর শেষে, বৈঠকখানার দিকে আস্তে আস্তে প্রমোশন পাওয়া নিয়ম ছিল।" তাঁর 'আপন কথা' গ্রন্থের 'এ-বাড়ি ও-বাড়ি' প্রবন্ধে 'এ-বাড়ি' বলতে তিনি ভদ্রাসন বাড়িকেই বুঝিয়েছেন। আর 'ও-বাড়ি' বলতে বৈঠকখানা বাড়ি বোঝায়।

খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের বেশির ভাগ সময় এদেশে ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। কথিত হয় এইজন্য নাকি মহারাজ আদিশূর বেদ বিহিত যজ্ঞাদি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কনৌজ থেকে বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ এনেছিলেন। আধুনিক বাঙালি ব্রাহ্মণের এরাই ছিল আদি পুরুষ। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ থেকেই রবীন্দ্রনাথের আদি পুরুষ ঠাকুর গোষ্ঠীর উদ্ভব। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ বসু যে বিবরণ দিয়েছেন সেই বিবরণ অনুসারে যশোহর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগনার জমিদার দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরীর প্রথম দুইপুত্র কামদেব ও জয়দেব মামুদ তাহির বা পীর আলি নামক স্থানীয় শাসকের চক্রান্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাদের বাকি দুই ভাই জয়দেব ও শুকদেব ইসলামধর্মে দীক্ষিত দুই ভাইয়ের সংস্পর্শে আসার কারণে সমাজচ্যুত হয়ে 'পিরালী' ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন।

শুকদেবের কন্যাকে বিবাহের জন্য পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারী তাঁর আত্মীয় ও সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে শুকদেবের আশ্রয়ে বসবাস করেন। ইনিই ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ। জগন্নাথের মধ্যম পুত্র পুরুষোত্তমের প্রপৌত্রের পুত্র মহেশ্বর বা মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন জ্ঞাতি কলহে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠার সমকালে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে গোবিন্দপুরে জেলে, মালো, কৈবর্ত পাড়ায় বসতি স্থাপন ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে জেলে, মালোদের কাছে ঠাকুরমশায় হিসেবে অভিহিত হন। তাদের দেখাদেখি ইংরেজরা ও 'Tagore' বলতে শুরু করেন। ফলে পঞ্চানন কুশারী হয়ে পড়েন পঞ্চানন ঠাকুর। এভাবেই পতিত ব্রাহ্মণ, পিরালী ব্রাহ্মণ 'ঠাকুর' পদবিতে অভিহিত হন।

রবিজীবনী-কার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন—"এই পঞ্চানন থেকেই কলকাতার পাথুরিয়া ঘাটা, জোড়াসাঁকো ও কয়লাঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠীর উৎপত্তি এবং শুকদেব থেকে চোরবাগানের ঠাকুর গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।"[৩]

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ি প্রতিষ্ঠা থেকে শতবর্ষ ধরে সরকারি চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে ঠাকুর গোষ্ঠী সম্পদ, সামাজিক সম্মান, আভিজাত্যের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি প্রতিষ্ঠা ও তাঁর আমলে সে সম্পদ, সম্মান, আভিজাত্য চরম শিখর স্পর্শ করেছে। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর (১ আগস্ট, ১৮৫৬) তা ক্রমশ ম্লান হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার কেবলই জমিদারী নির্ভর উচ্চবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে পিরালী ব্রাহ্মণেরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও বিবাহ ব্যাপারে যশোহরের পিরালী সম্প্রদায়ের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। একদিকে অন্য সম্প্রদায়ের কন্যা ঠাকুর পরিবারে এলে কন্যার পিতার পরিবার সমাজচ্যুত হতো। তাই তাদের আশ্রয় দিতে যত। অন্যদিকে ঠাকুর পরিবারের কন্যার বিবাহের সংকটও ঘনীভূত। পিরালী সম্প্রদায়ের বাইরের ছেলে ঠাকুর পরিবারে বিবাহ করলে তাঁকে স্বগৃহচ্যুত হয়ে ঠাকুর পরিবারে আশ্রয় দিতে হতো। এই বাস্তবিক সমস্যা অর্থাৎ ঘর জামাই প্রথা—ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। রবি জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন—

> পিরালী ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করা খুব সহজ ছিল না। সুতরাং যশোহর-খুলনা বা অন্যত্র থেকে যখন পাত্রী সংগ্রহ করা হত, অনেক সময়েই তখন কন্যার আত্মীয়স্বজনকেও প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে হত। আর কন্যার বিবাহ দেবার জন্য যে পাত্র সংগ্রহ করা হত, তাদেরও ঘরজামাই রূপে এই বাড়িতেই স্থান করে নেওয়া প্রায় অপরিহার্য ছিল। স্বভাবতই পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ক্রমে পরিবারের আকৃতি বৃহৎ রূপধারণ করেছে, আর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িও শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হয়েছে। দ্বারকানাথের নির্মিত বৈঠকখানা বাড়িও রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত এই বৃহৎ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে।

একান্নবর্তী এই বৃহৎ পরিবার ও জমিদারির কাছারিকে এক নিয়মে বেঁধে রাখার জন্য পুরোনো বাড়িতে পেটা ঘড়ির ব্যবস্থা—

> ঘড়ির এই রকম খামখেয়ালি চলার অর্থ তখন বুঝতাম না। সকালের ঘড়ি ঘুম-ভাঙাবার জন্যে, সাতটার ঘড়ি উপাসনার জন্যে, সাড়ে সাত হল মাস্টার আসার, পড়তে যাবার ঘড়ি। দশ স্নানাহারের সাড়ে দশ ইস্কুল ও আপিসের; চার, বৈকালিক জলযোগের, কাজকর্ম ও কাছারি বন্ধের পাঁচ হাওয়া খেতে যাবার। ঘুমোতে যাবার ঘন্টা একটা দশটা কি ন'টায় বোধ হয় বাজত না-কেননা তখন ঠিক ন'টা রাত্রে কেল্লা থেকে তোপদাগা হত আর আমাদের বৈঠকখানা ঈশ্বরদাদা 'বোম্‌কালী বলে এক হুঙ্কার দিতেন তাতেই পেটা ঘড়ির কাজ হয়ে যেত।[৫]

দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও পরিবারের পুরোনো

ধর্ম-কর্ম, পূজা-পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান—সবই নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে যোগ দেওয়ার (২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩ খ্রি./৭ পৌষ, ১৮৬৫ শক) পর দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। আগস্ট ১৮৪৬) হিন্দু আচার-পদ্ধতি না মানার কারণে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর গোষ্ঠির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। বাড়ি থেকে দুর্গোৎসব উঠে যায় অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত কমে যায়। হিন্দু অনুষ্ঠানের জায়গায় স্থান পায় ব্রাহ্ম-উপাসনামূলক অনুষ্ঠান-মাঘোৎসব, বর্ষশেষ, নববর্ষ ইত্যাদি আর আত্মীয় স্বজনের জায়গা নেয় রক্তের সম্পর্কহীন ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যেরা। অবনীন্দ্রনাথ তার স্মৃতিকথায় বলেছেন, যেবারের শীতে কর্তাদাদামশায় অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন সেবার মাঘোৎসব জাঁকিয়ে হতো। গাঁদা ফুল, দেবদারুপাতা, লাল বনাত, ঝাড়লণ্ঠন, গান বাজনা, লোকের ভিড়, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিনে (৭ পৌষ) মহোৎসবের সূচনা করেছিলেন গৌরিহাটির বাগানে ৭ পৌষ ১৭৬৭ শকে (২০ ডিসেম্বর ১৮৪৫)। অবনীন্দ্রনাথের 'এ-বাড়ি ও-বাড়ি' প্রবন্ধে এই মাঘোৎসবের বর্ণনাই পাই-যা কোনো এক ৭ পৌষের মাঘোৎসব—

> মাঘোৎসবে ভোজের বিরাটরকম আয়োজন হত তিনতলা থেকে একতলা। সকাল থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত খাওয়ানো চলত। লোকের পর লোক, চেনা অচেনা, আত্মপর, যে আসছে খেতে বসে যাচ্ছে। আহারের পর বেশ করে হাতমুখ ধুয়ে, পান ক'টা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়ছে-পাছে ধরা পড়ে অন্যের কাছে এরা সবাই। মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই, অনেকেই খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চলেছে এও আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতাম।

এই মাঘোৎসবেই বিশেষভাবে সংগীতের আয়োজন করা হয়েছিল। হায়দারাবাদ থেকে মৌলাবক্স আমন্ত্রিত হয়েছিলেন জলতরঙ্গ বাজনা ও কালোয়াতি গান করার জন্য—"মৌলাবাক্সোকে একটা অদ্ভুতকর্মা গোছের কিছু ভেবেছিলাম-জলতরঙ্গ ও কালোয়াতী গানের ভালোমন্দ বিচার শক্তি ছিলই না তখন কিন্তু মৌলাবাক্সো দেখে হতাশ হয়েছিলাম মনে আছে।" মাঘোৎসবে মৌলা বক্স আমন্ত্রিত হলেও কবিওয়ালা ও কালোয়াতদের আহ্বান করে বাড়িতে মজলিশ বসিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে শোনানো ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত। ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ রামলোচন—যিনি তাঁর মধ্যভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ১৭৯৯ খ্রি. দত্তক নিয়েছিলেন তিনি—

> ঠাকুর পরিবারে কিছু শৌখিন আভিজাত্য আনয়ন করেন। অপরাহ্ণে হাওয়া খেতে বের হবার প্রথা নাকি তাঁর দ্বারাই প্রবর্তিত হয়। এ ছাড়া কবিওয়ালা ও কালোয়াতদের আহ্বান করে বাড়িতে মজলিস বসানো ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে শোনানো তাঁর অন্যতম ব্যসন ছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরও সেই ঐতিহ্যের পাশাপাশি ব্যবসায়িক ও সামাজিকতার প্রয়োজনে বাড়িতে নানা ভোজসভার আয়োজন করেছেন। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

> নূতনগৃহ সঞ্চার।। মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ আগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটিতে অনেক২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।[৯]

দ্বারকানাথের এই নতুন গৃহটি ছিল বৈঠকখানা বাড়ি। সামাজিকতার প্রয়োজনে এই ভোজসভায় মদ্যমাংস পরিবেশিত হলেও দ্বারকানাথ তা গ্রহণ করতেন না। পরে তিনি এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তার পারিবারিক সংকট ঘনীভূত হয়, পত্নী দিগম্বরী দেবী দ্বারকানাথের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করেন। প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন—

> স্বামীর ভ্রষ্টাচারে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি তাঁর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। দ্বারকানাথও পত্নীর বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত হয়ে তদবধি বৈঠকখানা বাড়িতেই বাস করতে থাকেন এবং বেলগাছিয়ায় একটি বাগানবাড়ি কিনে বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত করে সেখানেই ভোজসভা, নৃত্যগীত ইত্যাদির আয়োজন করতেন।[১০]

সংগতকারণেই বোধ হয় পানাহার, নৃত্য-গীতের স্বরূপ বিচার করে বাড়ির ছোটো ছেলেদের উৎসব সভাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। মাঘোৎসবে মৌলাবক্সের গান-বাজনা শোনার জন্য পিশেমশায়ের সঙ্গে দরবার করতে হয়েছিল-অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—"ছেলেদের পক্ষে উৎসব-সভাতে হঠাৎ যাওয়া হুকুম না পেলেও অসম্ভব ছিল, অথচ মৌলাবাক্সোর গান না শুনলেও নয়। কাজেই হুকুমের জন্য দরবার করতে ছোটা গেল সকালে উঠেই। আমাদের ছোট্টখাটো দরবার শোনাতে এবং শুনে তার একটা বিহিত করতে ছিলেন ও বাড়ির পিশেমশায়।"[১১]

দ্বারকানাথের প্রথম বার বিলেত যাত্রার (৯ জানুয়ারি, ১৮৪২) পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম জীবনে বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়েও পিতৃদেব প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুর (১ আগস্ট ১৯৪৬/১৮ শ্রাবণ, ১২৫৩) পর বিপুল ঐশ্বর্যের প্রভু না থেকে নির্জনে ঈশ্বরে পালনী শক্তির আস্বাদ পাওয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সেই নির্জনতা লাভের উদ্দেশ্যে ১২৫৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের ঘোর বর্ষাতে গঙ্গায় বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকেই দেবেন্দ্রনাথ নির্জনতার সন্ধানে চির পথিক। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়—

> কর্তামশায় সব সময়ে বাড়িতে থাকেন না—বোলপুরে যান, সিমলের পাহাড়ে যান আবার হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে ফিরে আসেন। হঠাৎ নামেন কর্তা গাড়ি থেকে ভোরে, দরোয়ানগুলো ধড়মড় করে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি সাড়া পড়ে যায়-কর্তা এসেছেন।[১২]

কর্তা বাড়িতে না থাকলে বৈঠকখানাতে গানের মজলিশ জাঁকিয়ে অক্ষয়বাবু গলা ছাড়েন।[১৩] কিন্তু কর্তা থাকলে দুবেলা গানের মজলিশ খুব আস্তে চলে, নিয়মিত দশটা-চারটা কাছারি

চলে, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সকলে সচেতন হয়। ছোটোদের ওপর হুকুম আসে গোলমাল না করার, দাসীদের ঝগড়া চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যায়। এসবের মৌল কারণ শুধুমাত্র শ্রদ্ধা বা ভীতি নয়, নির্জনতার সন্ধানীর নির্জনতা ভঙ্গ না করা। এ-বাড়ি ও-বাড়ি প্রবন্ধে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ অবশ্যই করতে হয়—যা অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতির সূত্রে এসেছে—

> ও-বাড়ি থেকে শোভা যাত্রা করে বর বার হল এখনকার মতো বরযাত্রা নয়- বর চলল খড়খটি দেওয়া মস্ত পাল্‌কিতে, আগে ঢাক ঢোল, পিছনে কর্তাকে ঘিরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে অনেকগুলো হাতলণ্ঠন আর নতুন রঙ করা কাপড় পরে চাকর দরোয়ান পাইক।[৫]

বিবাহের শোভা যাত্রার এই স্মৃতি এবং বর সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ কেননা অবনীন্দ্রনাথের জন্মের (৭ আগস্ট, ১৮৭১) আগে ৫ জুলাই ১৮৬৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথের দুই বছরের অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাই তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়নি। ফলে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের বিবাহই অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। তখন অবনীন্দ্রনাথের বয়স ১২ বছর ৪ মাস, ২দিন। এবং এই বিবাহ অবশ্যই ব্রাহ্মধর্ম অনুযায়ী। কেননা দেবেন্দ্রনাথের অষ্টম সন্তান, রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সুকুমারী দেবীর বিবাহ (২৬ জুলাই, ১৮৬১) দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম অনুযায়ী এটিই প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান।

অবনীন্দ্রনাথের হালকাচালের এই টুকরো টুকরো স্মৃতিকথার পাঠে পাঠক আপাতভাবে হয়তো বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই স্মৃতিকথার ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসের তথ্য গুজে দিলে তা ইতিহাস আর ঐতিহ্যের দলিল হয়ে ওঠে। ঠাকুর বাড়ির ইতিহাস না জানা পাঠকের কাছে অবনীন্দ্রনাথের রচনা আগ্রহহীন পাঠ্য। অন্যদিকে ইতিহাস আর ঐতিহ্য জানা সচেতন পাঠকের কাছে অবনীন্দ্রনাথ দারুণ উপভোগ্য।

উৎসের সন্ধানে

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'উত্তরের ঘর, আপন কথা', "অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী", ১ম খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ২০
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বারবাড়িতে, আপন কথা', "অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী", ১ম খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ৪৫
৩. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী' ১ম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪
৪. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী' ১ম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩০
৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'এ-বাড়ি ও-বাড়ি', আপন কথা, "অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী", ১ম খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ৩৯
৬. তদেব : পৃ. ৪৩
৭. তদেব : পৃ. ৪২
৮. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী' ১ম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৬

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সংবাদ পত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৮-১৩৯
১০. উৎস-৮, পৃ. ১০
১১. উৎস-৫, পৃ. ৪২
১২. তদেব, পৃ. ৪১
১৩. তদেব, পৃ. ৪২
১৪. তদেব, পৃ. ৪৪